নারীর সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মারিয়াম আকতার

পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থান এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। স্বাধীনতার চার দশক পরেও সমাজের সর্বক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় নি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ করা গেলেও তা খুব উল্লেখযোগ্য নয়। পরিবার থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্র পর্যন্ত সব জায়গাতেই তারা সমঅধিকার ও সমঅংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত। সিদ্ধান্তগ্রহণ-প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণও সামান্য। সমাজের দর্পণ যে গণমাধ্যম, সেখানেও নারী অবহেলিত। নারী সামাজিকভাবে বঞ্চিত। নারীর সামাজিক বঞ্চনার চিত্র এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, নারীর সমঅধিকার উন্নয়নপ্রক্রিয়ায় অপরিহার্য; বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে, যেখানে দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর অর্ধেক পুরুষ ও অর্ধেক নারী।

ভূমিকা

নারী-পুরুষ পারিবারিকভাবে ভিন্ন, কিন্তু এই পারিবারিক ভিন্নতাকে সংস্কৃতি কিছু সামাজিক প্রত্যাশার আলোকে ব্যাখ্যা করে। নারীর আচরণ ও কার্যাবলি, তাদের অধিকার, সম্পদ, ক্ষমতা সবকিছুই পুরুষের চেয়ে ভিন্ন, যেহেতু তাদের পারিবারিক গঠন ভিন্ন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সকল সমাজ শিশুসন্তানের যত্ন নেওয়া ও তাদের গড়ে তোলার দায়িত্ব দেয় নারীকে। অন্যদিকে, সামরিক সেবা প্রদান ও জাতীয় প্রতিরক্ষার দায়িত্ব মূলত পুরুষ সদস্যের। নারীকে সকল কাজের সুযোগ করে দিতে হবে, সম্পদের সুযোগ দিতে হবে, কথা বলার অধিকার দিতে হবে, উন্নয়নপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও অবদান রাখার সুযোগ দিতে হবে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের জীবনমানের উন্নয়নই বৃহত্তর উন্নয়নের পথকে সুগম করে। শুধু বাংলাদেশের নয়, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার কোনো দেশেই নারী-পুরুষের সমান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত অধিকার লক্ষ করা যায় না। অনেক দেশেই এখনো নারীর সম্পদপ্রাপ্তি, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা পরিচালনা এবং স্বামীর মতামত ব্যতীত ভ্রমণের স্বাধীনতা নেই। নারী-পুরুষের এই অসমতা নারীর উন্নয়নপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও সুবিধাভোগের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করেছে।

সোমবার, জুন ৩, ২০১৩, বাংলাদেশের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন, যেদিন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী ও সংসদের স্পিকার জাতীয় সংসদে দেশ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যস্ত ছিলেন। আমরা যদি একটু পিছনে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিকে তাকাই, তাহলে আমরা দেখব যে সেখানে নারী ভোটার সংখ্যা পুরুষ ভোটারকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ২৭ নভেম্বর, ২০০৮-এ প্রকাশিত নিউ এজ-এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে দেশের মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৮ কোটি ১০ লাখ ৫৮ হাজার ৬৯৮ জন, যার মধ্যে ৪ কোটি ১২ লাখ ৩৬ হাজার ১শ ৪৯ জন ছিলেন নারী ভোটার। পুরুষ ভোটারের তুলনায় যা ছিল ১৪ লাখ ১৩ হাজার ৬০০ জন বেশি। বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী হওয়া সত্ত্বেও দুঃখজনক হলেও

সত্য যে বাংলাদেশের নারী বাকশক্তিহীন, সুবিধাবঞ্চিত, সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। এখনো নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন, তাদের মতামতের কোনো মূল্য নেই। নারী-পুরুষের এই বৈষম্য সমাজের সর্বত্রই লক্ষণীয়। সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ এই বৈষম্যকে আরো জোরদার করেছে। বাংলাদেশের সিংহভাগ নারী তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নন এবং মতপ্রকাশের অধিকার না থাকায় তারা তাদের অধিকার আদায়েও অক্ষম। এসব কারণ তাদের সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হবার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চনা

সোশ্যাল এক্সক্লুসন বা সামাজিক বঞ্চনা এমন একটি প্রক্রিয়া, যা ব্যক্তিকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণে বাধা দেয়। বার্নস (২০০৫:১৫) বলেছেন, সামাজিক বঞ্চনা একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া, যা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে বাধা দেয় এবং যা সমাজে একজন মানুষের সামাজিকভাবে একীভূত হবার মাত্রা নির্ধারণ করে দেয়। ল্যান্ডম্যান (২০০৬:১৯) সামাজিক বঞ্চনাকে বৈষম্য বলেছেন। বৈষম্য ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে এবং যা নির্ভর করে এক বা একের অধিক সামাজিক গুণাবলি বা সামাজিক পরিচয়ের উপাদানের ওপর। নারীর অন্তর্ভুক্তি সমাজের যুগান্তকারী পরিবর্তনের মূলে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)-র কৌশলগুলোর মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন ও অন্তর্ভুক্তি অন্যতম। ইউএনডিপি প্রাতিষ্ঠানিক শাসন ব্যবস্থার সকল স্তরে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে, যা তাদের গণসংলাপে সমানভাবে অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ-প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে। সবক্ষেত্রে নারীর সমান অংশগ্রহণ তাদের পরিবার, সমাজ, তথা দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দেয়। হেনিলো (২০১২:৬৫) বলেছেন, সামাজিক বঞ্চনা দলীয় সদস্য হিসেবে সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নের সুবিধা ভোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার সাথে সম্পর্কিত। মুসলিম সমাজে যখন পরিবারের সকলকে সঙ্গে নিয়ে উচ্চস্বরে 'আল্লাহ মহান' উচ্চারণে ছেলেসন্তানকে স্বাগত জানানো হয়, তখন একজন মেয়েসন্তানকে তার কানের কাছে ফিসফিস করে কোরানের কিছু অংশ শুনিয়েই এই কাজটি সারা হয়।

রাজনীতি ও সিদ্ধান্তগ্রহণ-প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ

নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অধিকার সর্বজনীন। আনুষ্ঠানিক রাজনীতি এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অর্থপূর্ণ চর্চার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সমাজের পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিক পরিস্থিতি এজন্য দায়ী। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন আমরা দেখি। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী এবং জাতীয় সংসদের স্পিকার নারী। কিন্তু রাজনীতিতে নারীর সাধারণ অংশগ্রহণের মাত্রা গণনা করলে দেখা যায় তা খুব সামান্য। বড়ো রাজনৈতিক দলগুলোতেও নারীর অংশগ্রহণ সীমিত। জাতীয় সংসদ আইন ও অধিকার প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। সেখানে অবশ্যই যথাযথ সংসদীয় কাঠামো থাকতে হবে, যাতে নারী প্রতিনিধিরা তাদের আসন নিশ্চিত করতে ও নীতি প্রণয়ন-সংক্রান্ত বির্তকে সমান ও অর্থপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। সংসদে নারীর অংশগ্রহণের দিকে তাকালে দেখা যায়, অষ্টম জাতীয় সংসদে (২০০১-২০০৬) মোট নারী সংসদ সদস্য ছিলেন ৫২ জন (সংরক্ষিত আসনে ৪৫ ও সাধারণ আসনে ৭), নবম জাতীয় সংসদে (২০০৯-২০১৩) ছিলেন ৬৯ জন (সংরক্ষিত আসনে ৫০, সাধারণ আসনে ১৯) এবং দশম জাতীয় সংসদে আছেন ৬৯ জন (সংরক্ষিত আসনে ৫০, সাধারণ আসনে ১৯)। রাজনীতিতে নারীর সমঅংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

সমাজের সকল খাতে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পুরুষের পাশে নারীর সমঅংশগ্রহণ আমাদের আরো এগিয়ে নেবে। আর তা নিশ্চিত করতে সমাজের সর্বস্তরের বিশেষ করে পুরুষ সহকর্মীর কার্যকর সহযোগিতা ও

সমর্থন দরকার। বাংলাদেশে একটা নতুন সকাল প্রয়োজন, যে সকালের সূর্যালোকে নারী-পুরুষ সমানভাবে আলোকিত হবে। নারীর অন্তর্ভুক্তি দেশকে সামনে এগিয়ে নেবে এবং দারিদ্র্য নিরসন ও কার্যকরভাবে দেশ পরিচালনার পথকে সুগম করবে। নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আইনানুগ ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনর্গঠন ও সংস্কার প্রয়োজন। সংবিধান সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকার দিলেও দেশের অনেক আইনে নারী-পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হয় নি, বিশেষ করে পারিবারিক আইন, সম্পত্তির অধিকার, অভিভাবকত্ব, প্রভৃতি। এসব আইন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার আওতায়ই সংস্কার করা প্রয়োজন। কারণ সংবিধানের মূলনীতির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ আইন বা আইনের অংশ সাংবিধানিক নিয়মেই বাতিল হয়ে যাবার কথা।

কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ

বাংলাদেশের সমাজ-সংস্কৃতির সর্বত্র লিঙ্গবৈষম্য এমনভাবে ছড়িয়ে রয়েছে, যা কন্যাশিশু ও নারীর উন্নয়নে নানাভাবে বাধা হয়ে কাজ করে। কন্যাশিশুকে পরিবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বোঝা মনে করে। তারা তাদের জন্ম থেকেই স্বাস্থ্যসেবাসহ নানা ক্ষেত্রে পরিবার থেকে ছেলেশিশুর তুলনায় কম সুবিধা পায়। পরিবারে নারীর নিয়ন্ত্রণ সীমিত এবং প্রায়ই তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। বাংলাদেশে ৪৮ শতাংশ নারী বলেছেন, তাদের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিষয়ে তাদের স্বামীরা সিদ্ধান্ত নেন। যেখানে ৩৫ শতাংশ বলেছেন, তাদের পরিবার ও বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত নেন তাদের স্বামী। নারীর বাড়ির বাইরে গিয়ে চাকুরি করার সুযোগও কম। তাদের কেবল ঘরের চার দেয়ালের ভেতর গৃহকর্মে নিয়োজিত হবার সুযোগ রয়েছে, কাজ হিসেবে যার কোনো সামাজিক স্বীকৃতি নেই। কারণ এ কাজের নগদ কোনো অর্থমূল্য নেই।

বাংলাদেশে নারী-পুরুষের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের অনুপাত ৩৬:৬৪, যা এমডিজির লক্ষ্যমাত্রার (৫০:৫০) চেয়ে এখনো অনেক কম। ২০০০ সালের জরিপে দেখা যায়, দেশের মাত্র ৪৩ শতাংশ নারী শিক্ষিত, যাদের বেশির ভাগ কেবল নাম লিখতে জানেন। প্রতি ৮ জনে ১ জন নারী, যিনি আয় করেন। কিন্তু তার আয় কীভাবে খরচ করা হবে তার সিদ্ধান্ত নেন অন্য কেউ। ৫ জনে ২ জন সিদ্ধান্ত নেন তার স্বামীর সঙ্গে মিলিতভাবে।

যতখানি সম্ভব কন্যাশিশুদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। শিক্ষাই পারে নারীকে এগিয়ে নিতে, শিক্ষা তাদের পরিবারে সিদ্ধান্তগ্রহণের সুযোগ করে দিতে পারে, যা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সুফল বয়ে আনে।

এখানে মজুরি বৈষম্যও প্রকট। একজন পুরুষ নির্মাণশ্রমিক দিনে ২২০ টাকা আয় করেন। কিন্তু একই কাজ করে একজন নারী পান ১৬০-১৮০ টাকা। অন্যায়ভাবেই ৩০-৬০ টাকা কম আয়ে বাধ্য থাকতে হয় নারীকে। খারাপ লাগলেও কিছু করার নেই তাদের, যেহেতু তারা তাদের পুরুষ সহকর্মীর মতো ভারী বোঝা মাথায় নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে, এটা নারীকে বঞ্চিত করার অজুহাত ছাড়া কিছু নয়।

নারীর যেকোনো বিষয়ে অংশগ্রহণ নির্ভর করে তার পুরুষ সঙ্গীর সিদ্ধান্তের ওপর। অনেক স্বামী কেবল তার স্ত্রীকে রাজনীতির মতো বিষয়ে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেন নিজের ও নিজেদের পরিবারের উন্নতির কথা ভেবে। স্বাধীনতার চার যুগ পরও নারীকে এদেশে অনেক প্রতিবন্ধকতার মোকাবেলা করতে হচ্ছে। জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত তাদের নানা সীমাবদ্ধতা, দমন, পীড়ন সইতে হয়, যা তাদের সত্যিকার স্বাধীনতা অর্জনের পথে বাধা হিসেবে কাজ করে।

নারী তার কর্মক্ষেত্রেও বৈষম্যের শিকার। শক্তিশালী ও প্রভাবসম্পন্ন পদগুলোতে পুরুষদের বসানোর একটা প্রবণতা সর্বত্র লক্ষ করা যায়। নারীর বিরুদ্ধে বেতন বৈষম্যের প্রমাণ রয়েছে। নারী শ্রমিকের সংখ্যা বাড়লেও বিদ্যমান বাজারকাঠামো নারীর পক্ষে শ্রমখাতকে সুবিধাজনক করতে কোনো ভূমিকাই রাখতে পারে নি। শিল্প কারখানা ও বড়ো বড়ো সংস্থাগুলোতে নারীকে কেবল প্রাথমিক পর্যায়ের পদগুলোতে দেখা যায়। নারী যথেষ্ট

শিক্ষিত ও যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও প্রায়ই তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করার কোনো সুযোগ দেওয়া হয় না। এএসএ ইউনিভার্সিটি রিভিউ, ভলিউম ৪, নম্বর ২ (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১০) অনুসারে, সমান কাজের জন্য সমান বেতন পান মাত্র ৩০ শতাংশ নারী। ৭০ শতাংশ বলেছেন, তারা তাদের কাজের সমপরিমাণ বেতন পান না। কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার ৭৪-৮০ শতাংশ নারী। সীমিত সম্পদের অধিকার এবং আয়ের ক্ষমতা নারীকে পরিবারের ভেতরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এবং সম্পদের বণ্টনে অংশগ্রহণের ক্ষমতাকে দুর্বল করে দিয়েছে। পুরুষের তুলনায় দুর্বল সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থান এবং অসম অধিকার নারীকে সমাজ ও জাতীয় পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বা সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। নারীর উপস্থিতি তাই স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সভা-সমাবেশে লক্ষণীয় নয়।

নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণ ও সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণ এমন একটি পরিবেশ এনে দিতে পারে, যা সহজেই জীবনমানের উন্নয়নের মধ্য দিয়ে সমাজ ও জাতির উন্নয়নের পথকে সুগম করবে। রাষ্ট্র, নাগরিক সমাজ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়সহ সকলের অংশগ্রহণ ও হস্তক্ষেপ নারীর অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তির সমতা নিশ্চিত করতে পারে। সর্বোপরি, এজন্য পুরুষ সমাজকে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

২০১২ সালে প্রকাশিত একটি জরিপ অনুযায়ী, গৃহস্থালির কাজ করে কোনো মজুরি পান না ৯১ লাখ নারী। তাদের মধ্যে কেউ আছেন পরিবারের সদস্য, আবার কেউ গৃহকর্মী। আবার মজুরি দেওয়ার ক্ষেত্রেও নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। পুরুষের চেয়ে নারীদের কম মজুরি দেওয়া হয়। শ্রমশক্তি জরিপের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৮ লাখ ৪৯ হাজার নারী দিনমজুর রয়েছেন। তারা পুরুষের সমান কাজ করেও মজুরি কম পান। পুরুষ দিনমজুরেরা পান গড়ে ১৮৪ টাকা, নারীরা পান ১৭০ টাকা। তবে শহরে নারী-পুরুষের মজুরি বৈষম্য কিছুটা কম। এদিকে 'বাংলাদেশের নারীর অনুদ্ঘাটিত অবদান অনুসন্ধান : প্রতিবন্ধকতা, সম্পৃক্ততা ও সম্ভাব্যতা' নামের এক গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের নারীরা দৈনিক গড়ে ১৬ ঘণ্টা গৃহস্থালির কাজ করেন, যার জন্য কোনো মজুরি তারা পান না। তারা সব মিলিয়ে প্রতিবছর ৭৭ কোটি ১৬ ঘণ্টা কাজ করেন। এতে এ কাজের অর্থমূল্য হয় ৬ হাজার ৯৮১ কোটি থেকে ৯ হাজার ১০৩ কোটি ডলার। এই অর্থ যদি বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) যুক্ত করা হতো, তাহলে এর আকার দ্বিগুণ হতো।

গণমাধ্যম ও নারী

আমরা যদি গণমাধ্যমের দিকে তাকাই, তাহলে কম-বেশি একই চিত্র দেখতে পাব। দৈনিক কালের কণ্ঠের প্রতিবেদক ফারজানা লাবণী বলেছেন, এটা এখন খুব পরিষ্কার যে, আমি যদি এই পেশায় টিকে থাকতে চাই আমাকে আমার পুরুষ সহকর্মীর চেয়ে অনেক বেশি কাজ দেখাতে হবে। একই সময়ে যদি দুটো ভালো প্রতিবেদন জমা হয়, আমার পুরুষ সহকর্মীর তৈরি প্রতিবেদন প্রধান সংবাদ (লিড নিউজ) হবে, আমার করা প্রতিবেদনটি নয়। কারণ আমি একজন নারী। (ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, জানুয়ারি ৭, ২০১২)। ফ্রিল্যান্সার কাকলী প্রধান বলেছেন, শারীরিকভাবে নারী পুরুষের থেকে দুর্বল হতে পারে, কিন্তু অল্প সময়ের নোটিশে পুরুষ সহকর্মী অনেক বেশি সংবাদ সংগ্রহে সক্ষম বলে নারী সংবাদকর্মীকে বাইরে রাখার কোনো যুক্তি নেই। অনেক অগ্রহণযোগ্য যুক্তি দিয়ে নারীদের পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। টেলিভিশন মাধ্যমসহ গণমাধ্যমে নারী সংবাদকর্মীর সংখ্যা ৫.০ শতাংশের কিছু বেশি (ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, জানুয়ারি ৭, ২০১২)। ০.৬ শতাংশ নারী কেবল সম্পাদকীয় বিভাগ ও ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে কাজ করেন। (গোলটেবিল বৈঠক, আর্টিকেল ১৯, দক্ষিণ এশিয়া, ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১২)। কিছু গণমাধ্যমে খেলাধুলা, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক বিট কেবল পুরুষ গণমাধ্যমকর্মীকে দেওয়া হয়। নারী কেবল সাংস্কৃতিক, বিনোদন ও জেন্ডার বিট করার সুযোগ পান। গণমাধ্যমের চাকুরিতে নারীদের নিরুৎসাহিত করে গৎবাঁধা মনোভাব, অন্যায়মূলক বিবেচনা, পুরুষ সহকর্মী কর্তৃক নির্যাতন ও চাকুরির

অনিশ্চয়তা। গণমাধ্যমে নারী সাংবাদিকেরা বঞ্চিত হচ্ছেন সুযোগ, মূল্যায়ন ও বেতন— এই তিনটি ক্ষেত্রে। এমনকি পুরুষ সাংবাদিকদের কারণে তারা উচ্চপদ ও মর্যাদাসম্পন্ন অবস্থানেও যেতে পারছেন না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এখনো এর মূল কারণ। পাশাপাশি রয়েছে পারিবারিক বাধা-বিপত্তি। তবে নারী সাংবাদিকদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীর এ পেশা গ্রহণ ও তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে সমাজের ইতিবাচক মনোভাব একান্ত প্রয়োজন। আরেকটি বিষয় হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি, যা নারীকে এ পেশায় আসতে বাধাগ্রস্ত করছে। এ ধরনের হয়রানির মধ্যে রয়েছে পুরুষ সহকর্মী কর্তৃক বিয়ের প্রস্তাব, ইভটিজিং ও যৌন হয়রানি। নারী এ পেশায় এখনো কম-বেশি অনিশ্চয়তায় ভোগেন। তবে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। ফলে নারী সংবাদকর্মীর সংখ্যা এই মাধ্যমে তুলনামূলকভাবে বেশি। পারিবারিক সমর্থন এবং সুনির্দিষ্ট মাতৃত্বকালীন নীতিমালা গণমাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণ আরো বৃদ্ধি করতে পারে। গণমাধ্যমে জেন্ডার ইস্যুর কাভারেজ বিষয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল সংবাদকর্মীকে সচেতন হতে হবে। পক্ষপাতহীন জেন্ডার বর্ণনা, পেশাগত এবং নীতিগত আকাঙ্ক্ষা, সততার সাথে পক্ষপাতহীন এবং নির্ভুল জেন্ডার-বিষয়ক সংবাদ উপস্থাপন সংবাদকর্মী ও সংবাদ মাধ্যমের দায়িত্ব। আমাদের নারী সংবাদকর্মীকে কর্মক্ষেত্রে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পদে পৌঁছানোর সুযোগ করে দিতে হবে। পুরুষের সাথে সমান পেশাগত সুযোগ করে দিতে হবে, যাতে তারাও তাদের পুরুষ সহকর্মীর মতো রাজনীতি ও অর্থনীতির মতো বিট কাভার করার দায়িত্ব পেতে পারেন।

দেখা যায়, বেশির ভাগ সংবাদে পুরুষকে উল্লেখ করা হয় সংবাদসূত্র হিসেবে। নারীকে অদৃশ্যমান করে রাখা হয়, তাদের কণ্ঠ ও ছবি কোনোটাই সংবাদপত্রে উল্লেখ না করে। এমনকি কিছু নারী, যারা বয়স্ক, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, বিশেষ কোনো ধর্মের এবং শ্রমিক শ্রেণির— তারা গণমাধ্যমে রীতিমতো উপেক্ষিত। এমনকি দেখা যায়, নারী-বিষয়ক বিভিন্ন সংবাদ জায়গা পায় সংবাদপত্রের বিশেষ পাতায়, গুরুত্বপূর্ণ প্রথম বা শেষ পাতায় নয়।

তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি এবং নারী

তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বা আইসিটি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু নারীর আইসিটি সেবার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পরিমাণ পুরুষের সমান নয়। বাংলাদেশে ফেসবুক পপুলেশন ৩.৩৯ মিলিয়ন, যার মাত্র ২.১ শতাংশ নারী। বাংলাদেশে নারীদের আইসিটির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে হবে। বাংলাদেশের আইসিটির সঙ্গে যুক্ত নারীদের বেশির ভাগই কর্মক্ষেত্রে এ সুবিধা ব্যবহার করেন। আইসিটিতে সমান প্রবেশাধিকার অর্থনৈতিক উন্নতি, উৎপাদনশীলতা ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন। বাংলাদেশ পরবর্তী গ্লোবাল আইসিটি হাব হওয়ার সম্পূর্ণ প্রস্তুতি শেষ করে এনেছে। এখন যা প্রয়োজন তা হলো এই সেক্টরে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। টেন্ডন (২০০৬:৫) বলেছেন, সরকারের প্রয়োজন একটি কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন ও কার্যকর করা, যা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

ম্যানছিনিলি (২০০৭:৭) বলেছেন, ডিজিটাল এক্সক্লুশন সামাজিক এক্সক্লুশনের প্রকাশ। ডিজিটাল প্রযুক্তিতে নারীর প্রবেশাধিকার খুব কম। বাংলাদেশের নারীরা খুব কমই আইসিটি পেশায় নিয়োজিত। নারীদের ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত হওয়া দরকার, যাতে তারা পেশা হিসেবে এই খাতকে বেছে নিতে পারে। ডিমাগিও ও হারগিত্তাই (২০০১:১) নারী-পুরুষের ডিজিটাল অসমতার পাঁচটি ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছেন— যন্ত্রপাতি বা পণ্য, ব্যবহারের স্বাধীনতা, দক্ষতা, সামাজিক স্বীকৃতি, প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণ। এমনকি বাংলাদেশের পরিবারগুলো তাদের মেয়েসন্তানকে শিক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে কম্পিউটার সায়েন্স, আইসিটি, ডিজিটাল টেকনোলজি বেছে নিতে বাধা দেয়। তারা মনে করে, এগুলো পুরুষের ক্ষেত্র, নারীর নয়।

ওয়াংমো, ভায়োলিনা এবং হক (২০০৪:১০) দেখেছেন, এশিয়ার দেশগুলোতে, আইসিটির সঙ্গে নারীর সম্পৃক্ততা পুরুষের সমান নয়। তার কারণ হলো ভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নারী আইসিটি মেশিন বা সেবা কোনোটাই কিনতে ও ব্যবহার করতে পারে না। কারণ তাদের অর্থনৈতিক-সামাজিক অবস্থান, ভৌগোলিক অবস্থান, শিক্ষার হার এবং স্থানীয় রাজনীতি। ওয়াংমো, ভায়োলিনা এবং হক (২০০৪:১২) বলেছেন, এশিয়ার দেশগুলোতে নারীরা বিশ্বাস করে, আইসিটির চাকুরিগুলো তাদের জন্য নয়, এগুলো কেবল পুরুষরা ভালো করতে পারে। আইসিটি শুধু প্রযুক্তি নয়, এটা নারীর ক্ষমতায়নের পথে গুরুত্বপূর্ণ একটি অস্ত্র। এ খাতে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণের পথকে সুগম করতে পারে।

নারী বঞ্চিত হচ্ছে তার পরিবারে, সমাজে, সিদ্ধান্তগ্রহণ-প্রক্রিয়ায় এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে। নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে তাদের মানসিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে শক্তিশালী করতে হবে। জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে নারী-পুরুষ উভয়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমাজের সকল খাতকে একত্রে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে, যা সমগ্র জাতির উন্নয়ন তথা দেশের উন্নয়নের পথকে সুগম করবে।

মারিয়াম আকতার সিনিয়র লেকচারার, মিডিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজম, ইউএলএবি। marium.akther@ulab.edu.bd

তথ্যসূত্র

১. Haq, M.A and Azad, A (2013). Four Decades of Women in Bangladesh: Changes and Challemges in Empowerment and Development. Gender Studies, vol. 1. No. 3, 23-34.

২. Genilo, J, W, Akther, M and Haque, M. (2013) Attracting and Keeping Bangladeshi Women in ICT Profession. ICT for Development. Vol.3 No 2, 120-144.

৩. Islam, M, A (2012). ICT: Women and ICT in Bangladesh. Retrieved on January 25, 2014, from http://teletechblog.blogspot.com/2012/05/ict-women-girls-in-bangladesh.html

৪. Abbas, M (June 2009), Women Empowerment and Digital Bangladesh. Retrieved on February 4, 2014, from http://www.modernghana.com/news/220001/1/women-empowerment-and-digital-bangladesh.html

৫. Islam, M, R, and Nath, B. (2012). Socially excluded people in Bangladesh: Causes and Processes. Asian Journal of Social Issues and Humanities, vol.2 (5), 355-367.

৬. Haider, S, K, U. (2012) Dimension and Intensity of Gender Inequality in Bangladesh: an overview. Journal of Research in Peace, Gender and Development, vol .2(10), 203-213.

৭. Jatri. State of Women in Journalism.

৮. UNICEF, Bangladesh. Women and Girls in Bangladesh. Retrieved February 2,2014,from http://www.unicef.org/bangladesh/Women_and_girls_in_Bangladesh.pdf

৯. Genilo, J, W (December 2012). Exploring Social Exclusion of Women in ICT Profession. ICT for Development. Vol.2, No.2,62-71.

১০. World Bank. (December 2001).Engendering Development. A World Bank Policy Research Report. Retrieved January 22, 2014, from http://siteresources.worldbank.org/PGLP/Resources/Engendering_Development.pdf

১১. শাহ, জাহাঙ্গীর, (মার্চ ২০১৪) আড়ালেই থাকছে নারীর অবদান। Retrieved March 8, 2014, from http://epaper.prothom-alo.com/displaypage.php?id=2014_03_08_1_6_b